Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 142–153
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে প্রতিবন্ধী চরিত্র : একটি মূল্যায়ণ

পাপ্পুসোনা গান্ধী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : pappusonagandhi.123@gmail.com

Keyword
প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, প্রতিবন্ধকতাবিদ্যা, প্রতিবন্ধকতা আন্দোলন

Abstract
আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধকতা একটি অত্যন্ত স্বল্প আলোচিত বিষয়। মানবীবিদ্যার মতো সম্প্রতি প্রতিবন্ধকতাবিদ্যাও বিদ্যায়তনিক পরিসরে একটি বিশিষ্ট স্বীকৃতি লাভ করলেও এখনও বৃহত্তর জনসমাজে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে যথাযথ সচেতনতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অজ্ঞতার কারণেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে সমাজে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু মিথ বা ভ্রান্ত ধারণা। ফলে প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে সমাজে হয় খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখা হয় নয়তো খুবই হীন প্রতিপন্ন করা হয়। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সচেতনতাকল্পে এবং তাদের স্বাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কয়েক দশক ধরে সারা বিশ্বে সক্রিয় আন্দোলন সংঘঠিত হলেও এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের জানাশোনা এখনও যথেষ্টই কম।

এতদ্যাবৎ রচিত হয়ে আসা বাংলা সাহিত্যেও প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে মূলত উপরোক্ত ধরনের সমাজমানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে। তবে তিলোত্তমা মজুমদার এ ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমী। ভাবনা-চিন্তাগত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর 'বসুধারা' উপন্যাসে অন্ধ এবং 'ঝুমরা' উপন্যাসে টোপর চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে যথেষ্ট সদর্থক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন।

এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন আলোচিত হয়েছে তিলোত্তমা মজুমদার কিভাবে প্রতিবন্ধকতাকে দেখেছেন সেই বিষয়টি, তেমনই আনুষঙ্গিকভাবে আলোচনায় চলে এসেছে প্রতিবন্ধকতার যথার্থ প্রকৃতি ও স্বরূপসংক্রান্ত তাত্ত্বিক প্রস্থানের প্রসঙ্গ, প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সামাজিক মনোভাবের প্রসঙ্গ এবং প্রতিবন্ধী আন্দোলনের (Disability activism) কথা।

Discussion

সমাজে ও সাহিত্যে যে সব প্রান্তিক মানুষেরা বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গেছেন আবহমান কাল ধরে তাদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবন্ধী মানুষেরা অন্যতম। প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্বন্ধে যে শুধু সমাজে সচেতনতার ব্যাপক অভাব আছে তাই নয়, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলাপ-আলোচনার পরিসরও অত্যন্ত সীমিত আমাদের সমাজে। ফলত শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে নানান রকমের ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। বিদ্যায়তনিক পরিসরে মানবীবিদ্যার মতো প্রতিবন্ধকতাবিদ্যাও (Disability Study) আজকে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হলেও, আজও বহু মানুষের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ন্যূনতম সচেতনতা বা ধারণাও লক্ষ্য করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্বন্ধে সমাজে হয় এক ধরনের অতিরঞ্জিত কিংবা একটা অতি হীন মনোভাব কাজ করে। কাজেই সাহিত্যে প্রতিবন্ধী মানুষদের যতটুকু চিত্রায়ণ হয়েছে তার মধ্যেও এই সব প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। তিলোত্তমা মজুমদার তাঁর সাহিত্যে বহু প্রান্তিক মানুষদের মতো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদেরও স্থান দিয়েছেন। বস্তুত, এ বিষয়ে তিনি অনন্য নজির স্থাপন করেছেন বলা চলে। কেননা তাঁর ভাবনা-চিন্তায় বেশ কিছু অস্বচ্ছতা থাকলেও তিনি যে সদর্থক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের চিত্রিত করতে চেয়েছেন তা সত্যই অভূতপূর্ব। অনুযোগ-অভিযোগের জায়গা, ওজর-আপত্তির বিষয় নিশ্চয় অনেক কিছুই আছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেকখানি প্রশংসাও তাঁর নিশ্চয় প্রাপ্য। আমরা মূলত তাঁর 'বসুধারা' উপন্যাসে অন্ধ এবং 'ঝুমরা' উপন্যাসে টোপর এই দুটি প্রতিবন্ধী চরিত্রকে দেখতে পাই। কাজেই মূলত এই দুটি চরিত্রকে অবলম্বন করেই আমাদেরকে আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

তবে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞাটি আমাদের খুব ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

> "Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others."[১]

অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বলতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকেই বোঝায় যারা কোনো দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক কিংবা স্নায়বিক অক্ষমতার কারণে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নানান বাধার সম্মুখীন হয়। এখানে 'দীর্ঘস্থায়ী অক্ষমতা' এবং 'সামাজিক মেলামেশায় অসামর্থ্য' এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে সাময়িকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন বা যদি কোনো ব্যক্তিকে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে না হয় তাহলে তাকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বলা যাবে না। সুতরাং প্রথমেই এ কথাটা স্পষ্টভাবে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, 'প্রতিবন্ধকতা' বা 'Disability' একটি পারিভাষিক শব্দ। কাজেই অনেকেই যে কথায় কথায় বলে থাকেন "আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী' এই কথাটি আদৌ প্রতিবন্ধকতাবিদ্যা সমর্থিত নয়। ঠিক এই কারণেই আমরা বসুধারার তৃণাঙ্কুরকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বলতে পারি না। তার পায়ের যে সমস্যাটি আছে সেটি মূলত সাময়িক এবং মূলত তৃণাঙ্কুরের মা নীলিমার কড়া শাসন তথা তৃণাঙ্কুরের চাপা স্বভাবের জন্যই তার সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে; প্রতিবন্ধকতার কারণে নয়। ঔপন্যাসিকও তার পঙ্গুত্বকে একটি সাময়িক অসুস্থতা তথা সমস্যা হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। প্রাথমিক এই কয়েকটি কথা মাথায় রেখে আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

তিলোত্তমা মজুমদারের 'বসুধারা' উপন্যাসের একটি অতি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল অন্ধ। অন্ধ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন একটি ছেলে। সব থেকে প্রশংসার তথা অভিনবত্বের বিষয় এই যে, এই দৃষ্টিহীন ছেলেটিকে ঔপন্যাসিক তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা না করে তাঁর এই উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন অন্ধ মাত্রই মনে করা হত অশুভ, অপয়া, পাপের ফসল। প্রাচীন গ্রীস সহ প্রাচীন ইউরোপের বহু দেশে তো অন্ধ শিশু জন্মালেই তাদেরকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেলা হত। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে এবং শিক্ষার বিস্তারের ফলে দৃষ্টিহীনদের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটলেও সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা খুব বেশি মোটেও পরিবর্তিত হয়নি। শিল্পসাহিত্যেও

দৃষ্টিহীনদের নেতিবাচক চিত্রায়ণও অতি সুলভ ঘটনা। বাংলার সাহিত্যিকদের কাছে তো অন্ধ মানেই হয় ভিখারি নয় তামসিক প্রবৃত্তির দাস। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'হাট', 'অঞ্জনা নদী তীরে চন্দনী গাঁয়ে' ইত্যাদি কবিতা, কিংবা তারাশংকরের 'তমসা', 'ভুবনপুরের হাট', সমরেশ বসুর 'মহাযুদ্ধের পরে', সোমেন চন্দের 'অন্ধ শ্রীবিলাসের কয়েক দিনের এক দিন' ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসের কথা। কিন্তু তিলোত্তমা মজুমদার এই গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে একজন উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে, একজন সংবেদনশীল, দরদী ব্যক্তি হিসেবে অন্ধকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তার থেকেও বড় কথা ফটিকবিল বস্তিতে ও তার আশেপাশে ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহের মানসসাক্ষী থেকে সে যেন হয়ে থাকছে সময়ের জীবন্ত দলিল। তার মনের ডায়েরীতে লেখা হয়ে যাচ্ছে যেন এক অবক্ষয়িত, ধ্বস্ত সমাজের ইতিকথা। বস্তুত, তিনি অন্ধকে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবপরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহনির্ভর এই উপন্যাসে একটি প্রান্তিক জীবনকে এতখানি গুরুত্ব প্রদান বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের প্রভাবে একজন দৃষ্টিহীন মানুষের বড় হয়ে ওঠার বিষয়টিকে যথাসম্ভব গুরুত্বসহকারেই দেখানো হয়েছে এ উপন্যাসে। ফটিকবিল বস্তির ঝুপড়িতে জন্ম গ্রহণ করা হতদরিদ্র অন্ধ তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষার আলোকপ্রাপ্ত না হলেও তার প্রতিবেশি মাস্টার কাকার সহায়তায় এবং নিজের প্রখর অনুভূতী দিয়ে সে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নিজের মতো করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে এবং নিজেকে ক্রমশ পরিণত করে তুলতে থাকে। এই মাস্টার কোনো মাস্টারমশাই নয় তার নাম সত্যব্রত দাস। সে বীরভূম থেকে আসা জনৈক গেঞ্জি কলের শ্রমিক। তার বিচক্ষণতার জন্য বস্তির লোক তাকে মাস্টার বলে ডাকে। সে চায় বস্তির মানুষগুলিকে তাদের শোষণ ও বঞ্চনা সম্বন্ধে, তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। যাই হোক, আমরা দেখি, মাস্টার গল্পের ছলে সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অন্ধকে শিক্ষা দেয় এবং এভাবেই সে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার নিজের মতো করে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে নেয়। যেমন - উদ্ধত, দাম্ভিক রাণীকে ঈশ্বরের শাস্তি দেওয়ার গল্প শুনে অন্ধের মনে প্রশ্ন জাগে যে, ভগবানও কি তাহলে মানুষের মতই অত্যাচারী? তার বন্ধু পলাশ যখন জোরে জোরে সুর করে করে কবিতা পাঠ করে কিংবা ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পড়ে তখন অন্ধ উদগ্রীব হয়ে তা শোনে এবং যতটা পারে বোঝার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনে অন্ধের মনে হয় তিনিও কি শিব, দুর্গা, গণেশের মতো কোনো একজন ঠাকুর" কিন্তু কোনো ঠাকুর তো কবিতা লেখে না? মাস্টার তাকে বুঝিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ একজন মানুষ, ঠাকুর নয়। তিনি অসংখ্য গান, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখেছেন। তবে কেউ তাকে ঠাকুর জ্ঞানে পূজো করতে চাইলে তিনি তাকে তথাকথিত ঈশ্বরের থেকে অনেক বেশি দেবেন। মাস্টার অন্ধকে শোনায় এক মিষ্টি দোকানির গল্প যে অন্যান্য ঠাকুরদেবতার ছবির সাথে তার দোকানে রবি ঠাকুরেরও ছবি রেখেছিল এবং যে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙিয়ে রাখার কারণ জানতে চাইলে সে বলেছিল, আজি মোর মনে হয় অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা। অন্ধকে মাস্টার বলে, ভালবাসা যেমন মানুষের অন্তর্গঠনের ইচ্ছে তেমনি পূজাও। অপরিসীম শ্রদ্ধার পর, ভালবাসার পর পূজা জেগে ওঠে। এই পূজায় কোনও মিথ্যে থাকে না। সংস্কার থাকে না। অন্ধ মাস্টারের এই সমস্ত কথাই যে বুঝেছিল তেমন নয়, কিন্তু এভাবেই তার একটি সংস্কারমুক্ত, উদার অন্তঃকরণ গড়ে উঠছিল।

মাস্টার তাকে শোনায় ইতিহাসের কথা, মহাভারত মহাকাব্যের কথা। মহাকাব্য কাকে বলে অন্ধ জানে না কিন্তু তার মহাভারতের কাহিনী শুনতে খুবই ভাল লাগে। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে বীর যদি হতে হয় তাহলে অর্জুন নয়, সে অভিমন্যুর মতো বীর হবে। ভগবানকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতে কে না পারে। মাস্টারের বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা যেন অন্ধ চোখের সামনে ঘটতে দেখতে পায়।

> "মাস্টারের মুখে অন্ধ যখন নকশাল ছেলেদের কথা শোনে, কল্পনা করে মাঠে ময়দানে অলিতে গলিতে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে একটা ছেলে। হাতে হয়তো বন্দুক আছে, হয়তো নেই, পকেট থেকে একটা বোমা বার

> করে ছুঁড়েও দিতে পারে কখনও, হয়তো কিছুই নেই। এমনকী চটি অবধি খুলে ফেলেছে যাতে জোরে ছোটা যায়, আর তাকে তাড়া করছে ছ'জন-সাত জন সশস্ত্র পুলিশ। পুলিশ কিংবা গুণ্ডা, কে যে— সব সময় বুঝতে পারে না অন্ধ। শুধু দেখতে পায়—একজনকে তাড়া করছে সাতজন, তার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে। এবং আশ্চর্য লাগে তার। সেই কবে, কোন যুগে হিসেব নেই, সপ্তরথী দ্বারা অভিমন্যুর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। আজও তেমনি চলেছে। এ কথা মাস্টারকে বলেছিল অন্ধ। মাস্টার বলেছিল, এই যে সর্বকালীনতা, এই হল মহাকাব্যের মূল শক্তি।"[২]

মাস্টার অন্ধকে দেয় যেমন বিশ্বসংসারের পাঠ, তেমন টেপি দেয় তাকে যৌনতার পাঠ। সে তার বুক অন্ধের গায়ে চেপে ধরে, তার যোনিদেশে অন্ধের হাত ছুঁইয়ে দেয়। অন্ধের আড়ষ্টতাকে উপেক্ষা করে টেপি তার গায়ে ঢলে পড়ে। এভাবেই ঔপন্যাসিক অন্ধকে জীবনের পাঠ দিতে থাকেন।

সময় যতই এগোতে থাকে, প্রকৃতির নিয়মেই অন্ধের চিত্তেও ক্রমশ বাসা বাঁধতে থাকে অবসাদ। একদিকে তার শরীরে যৌন চেতনার নবতর উন্মেষ তাকে যেমন দিশেহারা, বিপন্ন করে তোলে, তেমনই বেকারত্বের যন্ত্রণা, কোনো কিছু উপার্জন করতে না পারার অক্ষমতা তাকে কুরে কুরে খায়। তার বন্ধু পলাশকে পড়াশোনা শিখতে দেখে তার মনে পড়াশোনা না শিখতে পারার এক অব্যক্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়ে যায়। এ জগৎ পুরোটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন, মাস্টারের এই কথার সাথে সে এখন পুরোপুরি সহমত পোষণ করতে পারে না। পারিপার্শ্বের আনন্দসংগীত যে তার চিত্তকে চকিতে স্পর্শ করে যায়। সারা দিন টো টো করে অর্থহীন ঘুরে বেড়ানোয় এবং অনর্থক কালাতিপাতে তার আর মন টেকে না। সব মিলিয়ে অন্ধের জীবনে এক সামগ্রিক আত্মিক সংকটের সূচনা হয়। ঔপন্যাসিক অন্ধের এই সংকটের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

> "ফটিক বিল থেকে সমস্ত শীত গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাড় কাঁপিয়ে দেয় আর সে দ্রুত পা চালায়, তাড়াতাড়ি গায়ে চাদর জড়াবে বলে, তখন তার এই অন্ধ বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যায়। সন্ধ্যার পরে যে অনিবার্য অন্ধকার নেমে আসে, তার কেবলই মনে হয় তার নিজের বেঁচে থাকার মধ্যেও ওই রকম অন্ধকার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। যদিও মাস্টার বলে—এ দেশের মানুষ অন্ধের চেয়েও অনেক বেশি অন্ধ। রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়তর অন্ধকার তাদের জীবনে ছেয়ে আছে। কিন্তু যখন মাইক বাজে—রূপ তেরা মাস্তানা—গান ভরে যায় আকাশে, দলে দলে ম্যাটাডোর ভর্তি করে কত লোক যায় পিকনিক করতে, তখন অন্ধর মাস্টারের কথা বিশ্বাস হয় না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে মাস্টারের সব কথা বিশ্বাস করত, এখনও করতে চায় কিন্তু কোথায় একটা ফাটল ধরেছে তার নিজেরই মধ্যে, যা টপকানোর সাধ্য নেই তার। কিছুদিন আগেকার সব ভাল লাগা পাল্টে যাচ্ছে। সব বিশ্বাসে নতুন করে মোচড় লাগছে। অনেক নতুন প্রশ্ন ও বোধ জেগে উঠছে নিজের মধ্যে। তার শৈশবের বন্ধু হীরু সে-দিন থেকে কাজে লেগে গেল। তার বাবার সঙ্গে জুতো সারাইয়ের কাজে বসবে সে। চামড়া কাটবে, সেলাই দেবে, পেরেকও ঠুকে দেবে কোনও কোনও জুতোয়। মাখনের বাবা মাখনকে একটা বাল্ব তৈরির কারখানায় দিয়ে দিয়েছে। বড় বাল্ব নয়। মাখন বলছিল ওগুলো হচ্ছে টুনি বাল্ব। উৎসব-টুৎসব হলে যে আলোর সাজ লাগানো হয় তার কাজে লাগে। অন্ধর চারপাশে সবাই কাজে লেগে যাচ্ছে, একমাত্র তারই কিছু করার নেই। তার এতদিনের চেনা দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছে অচেনা বোধ। এতদিন টেপির সঙ্গে সে মাগ-ভাতার খেলত, ইদানীং টেপি ডাকলে সে আর যায় না। তার ভয় করে। টেপির বুকটা কীরকম গুটি পাকিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, অন্ধর হাতটা নিয়ে সে চেপে ধরে ওই জায়গায়। আগে অন্ধ ভাবত এটা খেলা। সে খেলত। যেমন মেয়েরা খেলে। রান্নাবাটি খেলে। নারকোলের মালায় পাতার কুঁচি নিয়ে মাকে নকল করে বলে, আজ সীমচচ্চড়ি আর ভাত— তেমনই মাগ-ভাতারে কী হয়, আড়ালে অন্ধকারে তারা কী করে, আদ্যপ্রান্ত জেনেও সে শুধুই খেলত। নকল করার খেলা। আগুন বিহীন উনুনে নকল রান্নার মতো শরীর বিহীন শরীরে খেলা। কিন্তু এখন আর অন্ধ সেটা পারছে না। টেপি তার হাত টেনে নিলে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। শরীরে এক নতুন রকম বোধ, যা ভয় ধরিয়ে দেয়, যা অসুখের মতো লাগে, কিন্তু এ অসুখের

> কথা কারওকে বলা যাবে না। যে মাস্টারকে অকপটে সব বলতে পারে সে তাকেও বলা যাবে না। তার মন খারাপ হয়ে যায়। কেন এমন হবে? কেন এমন কিছু ঘটবে যা সে চায়নি? অন্ধর এখন সারা দিন মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ওইখানেই আনন্দ আছে, ওইখানেই নির্ভরতা আছে। যেন মাস্টারের সঙ্গে থাকলে অন্ধর আর অনভিপ্রেত অনুভূতি হবে না।"[৩]

অন্ধের খুব ইচ্ছে করে মাস্টারের মতো হতে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ছাড়া কিভাবে সে তা হতে পারবে, তা অন্ধ ভেবে পায় না। বাস্তবিকই দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়া করতে পারার কথা ফটিকবিল বস্তির মতো জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। মাস্টার যে এক বার তাকে বলেছিল– মানুষকে শুধু ভালবাসার জন্যই কাঙাল হওয়া সাজে, আর অন্য সমস্ত কিছুর জন্য কাঙালিপনা মানুষকে আর মানুষ রাখে না, পশু করে দেয়– সে থেকে অন্ধ ঠিক করে নিয়েছে যে, সে আর যাই হোক প্রবৃত্তির দাস হবে না। কিভাবে মহৎতর মানুষ হয়ে ওঠা যায় তা সে জানে না, কিন্তু নিজেকে পরিশিলিত করার, মার্জিত করার প্রয়াস সে জারি রাখে অবিরাম। এইখানেই পূর্বাপর সাহিত্যিকদের থেকে তিলোত্তমা অনেকখানি স্বতন্ত্র হয়ে যান তার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। যাই হোক, অন্ধ তার এই প্রার্থিত জীবন পেতে পারে না বলেই সে প্রায়সই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এই সব অর্থহীন বিষণ্ণ মুহূর্তে অন্ধের মনে পড়ে যায় মাস্টারের কাছে শোনা রবীন্দ্রনাথের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা। সে হাতে তুলে নেয় বন্ধু পলাশের বই। বইয়ের গন্ধ শুঁকে তার সমস্ত বিষণ্ণতা, সমস্ত দুঃখ কেটে যায়।

অন্ধের অনুভূতির মধ্য দিয়ে দৃষ্টিহীনদের ইন্দ্রিয়চেতনার বিষয়টিকেও বেশ ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখি ফটিক বিলের ধারে একটা ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে উদাস অন্ধ প্রকৃতির পাঠ নিচ্ছে।

> "সে টের পাচ্ছে সন্ধে নামছে, পাখিরা ফিরে আসছে বাসায়। বিলের জলে যত মাছ শেষবারের মতো হুস করে ভেসে উঠেই ডুব মারল। যেন আকাশটা দেখে নিচ্ছে। ট্রেন যাবার শব্দ পাচ্ছে অন্ধ। ঘটঘটাং ড্যাং চোঁও...কিচ চিক কিচ চিক খস্—বড্ড ধাতব। আগাগোড়া আশ্চর্য ধাতব। একটা বড় শ্বাস ফেলল সে, এখন আর কাজ নেই। এখন বাড়ির দিকে ফেরা। সারা দিনে কাজেই বা তার কী? শুধু ঘুরে বেড়ানো, এর ওর বাড়ি কান পাতা, শব্দ শুনে গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করা কে কেমন আছে। কে কী করছে। চোখ নেই বলে সে কিছুই করতে পারে না। শুধু দৃষ্টির অন্য পার থেকে সমস্ত পৃথিবীকে শুষে নিতে চায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে, বিশেষ করে যখন এরকম সন্ধে আসে।"[৪]

তাদের বস্তির প্রত্যেকটি পরিবারের আলাদা আলাদা গন্ধ অন্ধ বুঝতে পারে। বস্তির প্রায় প্রত্যেকটি গন্ধই তার চেনা। সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বড় পাথরটার গায়ে হোঁচট খেলে বুঝতে পারে সিনেমার টিকিট বিক্রেতা মুন্নাদার বাড়ি এল; আবার ফুল গাছের গন্ধে বুঝতে পারে মাস্টারের বাড়ির কাছে এল। সব কিছুই খুব ভাল মনে রাখতে পারে অন্ধ। গন্ধ, পায়ের শব্দ, বাতাসে উষ্ণতার তারতম্য—সব। সে বলে দিতে পারে, সোমবার বাতাসে জলের পরিমাণ বেশি ছিল কিন্তু মঙ্গলবারের হাওয়া শুকনো। মাস্টার অন্ধকে বলে, তার মাথাটা খুবই পরিষ্কার। এভাবে দৃষ্টিহীনদের শব্দময়, গন্ধময় জগৎকে এবং তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে এখানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, দেখতে না পাওয়ার কারণে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিহীনদের তেমন কোনো ধারণা বা বোধ থাকে না; কিন্তু দৃষ্টিহীনরা চোখে দেখতে না পেলেও তাদের মনকেও যে যাবতীয় জাগতিক ঘটনাসমূহ প্রভাবিত করে, একজন দৃষ্টিমানের মতোই একজন সংবেদনশীল দৃষ্টিহীনের মনেও তা যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা মাস্টার ও অন্ধের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

> "অন্ধ বলল—কপিলাদির কী হয়েছে মাস্টারকাকা?
> মাস্টার বলল—কপিলার কথা তুই শুনেছিস বুঝি? অবশ্য তুই কী-বা শুনিস না! ঈশ্বর তোকে চোখ না দিয়ে একপক্ষে ভালই করেছে রে অন্ধ। এই পৃথিবীর সমস্ত বিকৃতি তুই শুনিস শুধু, তোকে দেখতে হয় না।
> অন্ধ বলল—তাতে কি কিছু কম পড়ে?

মাস্টার চমকে উঠল—কী বললি?
অন্ধ বলল—আমি দেখতে পাই না, কিন্তু এই পৃথিবীটা কেমন হওয়ার কথা সে তো তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ। চোখ ছাড়া যেমন যেমন বোঝা যায়, আমি তেমনই বুঝেছি। তোমার বোঝার চেয়ে, সে-বোঝাটা আলাদা। কিন্তু আমি তো ওইরকম করেই চাই। যখন বুঝতে পারি—যেমন চাই তেমন হচ্ছে না, তখন আমারও তোমার মতো কষ্ট হয়।
মাস্টার অন্ধর চুলগুলো নেড়ে দিল, বলল—তুই খুব আশ্চর্য রে অন্ধ। তুই যখন কথা বলিস, মাঝে মাঝে আমার কেমন ধাঁধা লেগে যায়, যেন তুই—এক ভগবান বা দার্শনিক বসে আছিস আমার সামনে।"[৫]

এছাড়াও ক্রন্দনরত কপিলার চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া, পলাশদের ঘরে একটুও চাল নেই শুনে তার জন্য মাস্টারের কাছে কিছু টাকা চেয়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্ধের সংবেদনশীল তথা দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের এই বিশ্বজগৎ মূলত দৃষ্টিনির্ভর হওয়ায় দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে মানুষের মনে নানান রকম মিথের প্রচলন থাকতে দেখা যায়। দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে যথাযথ সচেতনতার অভাবের কারণেই এমনটা ঘটে থাকে। এই উপন্যাসেও তার প্রভাব দেখি। কপিলার গর্ভবতী হয়ে পড়ার সংবাদ পাওয়ার আগের মুহূর্তে একটা খারাপ ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া, ফুলরেণু ও দেবোপমের মৃত্যুর আগে এবং কপিলা তার পেট খালাস করে আসার পর রক্তের গন্ধ পাওয়া, বন্যার আগে বন্যার গন্ধ পাওয়া ইত্যাদি বিষয় অন্ধ চরিত্রে আরোপ করে আসলে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার ছলে দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে সমাজে বদ্ধমূল থাকা অলৌকিকত্বের বিষয়টিকেই ইন্ধন দেওয়া হয়েছে। যে জায়গায় দেবোপম ও ফুলরেণু ট্রেনে কাটা পড়েছিল সেই মরণব্রিজের দিক থেকেই নাকি অন্ধ রক্তের গন্ধ পাচ্ছিল। এমনকি, পলাশের যে বাবা এসেছে সেটাও নাকি অন্ধ মাস্টারের বাড়ি থেকেই গন্ধ পেয়ে বুঝতে পেরেছে। absurd! বলাই বাহুল্য যে, চূড়ান্ত অলৌকিকতার আরোপ করে এখানে দৃষ্টিহীন চরিত্রের একটি ভ্রান্ত চিত্র আঁকা হয়েছে। দৃষ্টিহীনরা দেখতে না পাওয়ার কারণে অনেকাংশেই গন্ধের ওপর নির্ভর করে ঠিকই তা বলে তাদের এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা মোটেও থাকে না।

এই প্রবণতা প্রতিবন্ধীদের জন্য সামগ্রিকভাবে অতি বিপদজনক। এই ধরনের মানসিকতাই অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ (inclusive society) গঠনের প্রধানতম অন্তরায় তথা দৃষ্টিহীনদের অপরায়ণের প্রধানতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা দেখি, অন্ধের সব থেকে ঘনিষ্ঠতম যে মানুষটি সেই মাস্টারের মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

"মাস্টার জানে অন্ধ গন্ধ পায়। এতদিন সে সময়ের ঘ্রাণ পেত। মরশুমের ঘ্রাণ, বইয়ের গন্ধ। এ পর্যন্ত মাস্টারের আশ্চর্য লাগেনি। কারণ কোনও ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হলে অন্য অনুভূতিগুলি প্রখর হয়ে যায়, কিন্তু ইদানীং অন্ধ যেন ভবিতব্যের গন্ধ পাচ্ছে। মাস্টারের বুকের মধ্যে সিরসির করে। সে কোনওদিন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু অন্ধের অনুভূতিগুলি ক্রমে ব্যাখ্যাতীত হয়ে যাচ্ছে। অন্তত সাতদিন আগে, যখন মাস্টার রীতিমতো সুস্থ তখন অন্ধ তাকে বলেছিল— তোমার গায়ে আমি জ্বরের গন্ধ পাচ্ছি—এখন মাস্টারের গা ভর্তি জ্বর। আজ অন্ধ রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। মাস্টার বুঝতে পারে এ গন্ধের এত তীব্রতা যে অন্ধের মুখে কষ্টের ছাপ পড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে মাস্টারের দু'চোখ বুজে আসে।"[৬]

ঔপন্যাসিক অবশ্য, মাস্টারের জবানিতে বলে নিয়েছেন : 'অন্ধ যে আগে থেকে বুঝতে পারছে তা কি ঐশ্বরিক বলে ভেবে নেবে সবাই? গভীর অনুভূতিপ্রবণতা থাকলে এরকম হয়। কোনও কল্পনা ও বাস্তবের সমাপতনও হতে পারে।' কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের তরফ থেকে আরও একটু বেশি পরিমিতিবোধ প্রত্যাশিত ছিল। আসলে দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে জনসমাজে সচেতনতা এতই কম এবং তাদের নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাগুলি এতটাই জোরালো যে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিচারবিবেচনা করার কথা মানুষের বিশেষ মনেই হয় না – আর এই সমস্ত ধারণাই যদি আবার কোনো শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের বলিষ্ঠ কলমের সমর্থন লাভ করে তাহলে সেই সব ভ্রান্ত ধারণাগুলোর ভিত তো আরও সুদৃঢ় হবেই। কিছু মানুষ যেমন দৃষ্টিহীনদের দেবতাজ্ঞানে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে চান, কিছু মানুষ তেমনই আবার তাদেরকে অতি হীন মনে করে তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকে। খুব কম সংখ্যক মানুষই তাদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে থাকে।

দৃষ্টিহীনরাও যে আসলে দৃষ্টিমানদের মতোই সাধারণ মানুষ, তাদের যে আদৌ কোনো রকম অলৌকিক ক্ষমতা নেই এই বোধ যত দিন না সমাজের সর্ব স্তরে সঞ্চারিত হবে তত দিন দৃষ্টিহীনরা সমাজে অপাংক্তেয়ই থেকে যাবে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (যে সমাজে দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীনরা সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবেন) গঠনের জন্য দৃষ্টিহীন মানুষদের যে নিরন্তর সংগ্রাম তাও সফল হবে না।

বস্তুত, অন্ধ চরিত্রটির মধ্যে প্রভূত সম্ভাবনা থাকলেও এই চরিত্রটি তার স্বমহিমায় বিকশিত হতে পারেনি। জ্ঞান ও অজ্ঞানতার দোলাচলতায়, বোঝা ও না বোঝার দ্বন্দ্বে এই চরিত্রটি সব সময়ই উদ্বেল থেকেছে। যে পরিমাণ মেধা ও বোধশক্তি থাকলে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় অন্ধের তার অভাব ছিল না। অথচ স্কুলে যেতে না পারার ফলে, একটি সুপরিকল্পিত পন্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে না পেরে তার মেধার যথার্থ বিকাশ ঘটল না। ঈশ্বরসংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা, যৌনতার আবেদন, জ্ঞানের আলো তাকে চকিতে ছুঁয়ে গেল মাত্র; তা তার চেতনায় কোনো সুসংহত রূপ লাভ করল না। সাধারণ নিরক্ষর মানুষ যেমনভাবে নিজেদের মতো করে জগৎ ও জীবনের জটিল দার্শনিক প্রশ্নাবলীর সমাধান খুঁজতে চায়, যেমনভাবে পারিপার্শ্বকে অনুভব করে অন্ধ অনেকটা তেমনইভাবে জগৎ ও জীবনকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, অন্ধের মায়ের একটা নাম দেওয়া হয়েছে সুমিত্রা, কিন্তু অন্ধের কোনো নাম দেওয়া হয়নি। মাস্টার অবশ্য তাকে এক বার কথায় কথায় বলেছিল যে, তার একটা ভাল নাম দিতে হবে কিন্তু অন্ধ তাতে বিশেষ আমল দেয়নি; তার বক্তব্য সে যা তাই। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই অন্ধকে নামহীন করে রেখেছেন। তার যেন একজন স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে ওঠার কোনো প্রয়োজন নেই, সে অন্ধ এই যেন তার যথার্থ পরিচয়। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা যে আগে একজন ব্যক্তিমানুষ এবং তার পরে প্রতিবন্ধী এ সত্য এখানে ঔপন্যাসিক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। তাছাড়া আরও একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে যে, এখানে অন্ধকে কি সমস্ত দৃষ্টিহীনদের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে? তাহলে এই চরিত্রচিত্রণে কিন্তু অনেকখানি খামতি থেকে যায়। ঔপন্যাসিককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।[৭]

যাই হোক, এ প্রসঙ্গে মাস্টারের সাথে অন্ধের কথোপকথনের একটি অংশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাস্টারের কাছে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসের কাহিনী শুনতে শুনতে অন্ধ মাস্টারকে আসন্ন বন্যার গন্ধ পাওয়ার কথা বললে মাস্টারের মনে হয়েছে অন্ধ কি সত্য সত্যই জন্তু জানোয়ারের মতো সব কিছুই আগে থেকে টের পেয়ে যায়?[৮] এটাই হয়েছে। অন্ধকে দেখে কখনও পশুবৎ কখনও বা কোনো লোকোত্তর জগতের জীব বলে মনে হয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রটি একটি স্বাভাবিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক আয়োজন সত্ত্বেও এবং ঔপন্যাসিকের সদর্থক মনোভাব সত্ত্বেও এখানেই প্রতিবন্ধী চরিত্র চিত্রণে তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা।

আমরা আরও দেখি যে, বস্তিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে মাস্টারের পিঠে চড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার সময় অন্ধের কেবলই নিজেকে বোঝা মনে হতে থাকে, তার নিজের অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হতে থাকে। মাস্টার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

> "শোন, অন্ধ, শোন। পৃথিবীতে সবার ভূমিকা এক হয় না। এই যে আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি অন্ধ, আমার নিজের জন্মের বেশ একটা অর্থ আছে এতে। যেন আমার জন্ম, আমার বেঁচে থাকা শুধু আমার জন্যই নয়। তোর জন্যও। মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আমার নিজের কাছে নিজের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তোকে পিঠে নিয়ে মনে হল, না, এটুকু সার্থকতা তো আজও ফুরোয়নি। ...অন্ধ, মানুষ যেমন নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে তেমনি পরস্পরের জীবনকে সার্থক করে তোলাও তার কাজ। অন্যকে সার্থক করেও নিজের জীবনের অর্থ পাওয়া যায়। ..."[৯]

এভাবেই অন্ধের বেঁচে থাকার একটা মানে দাঁড় করান ঔপন্যাসিক; অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা তার নিজের জন্য যতটা না প্রয়োজন তার থেকেও বেশি প্রয়োজন অন্যের জীবনকে সার্থক করার জন্য। ঠিক যেমন থিয়েটার দেখে মানুষের লোকশিক্ষা হওয়ার কথা বলেছিলেন রামকৃষ্ণ,[১০] তেমনই অন্ধের বেঁচে থাকাও অন্যকে মার্জিত, সংস্কৃত, উন্নততর করে তোলার জন্য। এখানেই একটি অতিশয় সম্ভাবনাময় চরিত্রের বিপর্যয়মূলক পরিসমাপ্তি। এ আসলে নিছক অন্ধের

নয়, তাবৎ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরই অর্থহীন বেঁচে থাকার একটা প্রতীকি সমাধান খুঁজে নেওয়া। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের আত্মোন্নতির জন্য যে সচেতনতা এবং পরিকাঠামোমূলক উদ্যোগের প্রয়োজন, তাদেরও যে নিজের জীবনকে উপভোগ করার জন্যই বেঁচে থাকার অধিকার আছে, এই সব মৌলিক বিষয়গুলিই উপেক্ষিত থেকে গেল শেষ পর্যন্ত।

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে আরও একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধী চরিত্র হল 'ঝুমরা' উপন্যাসের শতরূপ বা টোপর। টোপর একজন অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে। এই চরিত্রটির চিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিক অধিকতর বাস্তবানুগ থেকেছেন। টোপরের প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ, তার প্রাত্যহিক সংগ্রাম, তার জীবনের সংকট– সমস্ত কিছুই তিনি সবিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন।

টোপরের প্রতিবন্ধকতার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। টোপরের জানুসন্ধি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অসাড়। ডাক্তারি ব্যাখ্যায় একে বলে হাফ-প্যারালিটিক। জানু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আংশিক সক্ষমতা। দাঁড় করিয়ে দিলে পড়ে যায়। পায়ের উপর পা তুলতে পারে না। কিন্তু তুলে দিলে অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ছেঁচড়ে নামিয়ে নিতে পারে। টোপরের প্রাত্যহিক জীবনের সংগ্রামকেও অতিশয় বস্তুনিষ্ঠতার সাথে ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা দেখি, টোপর বহু কসরত করে দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় গাড়ি চালাতে শিখেছে। তাছাড়াও তাকে প্রয়োজনের সময় সহায়তা করার জন্য থাকে পলাশ। ঔপন্যাসিক এই বিষয়টির অতিশয় বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

> "গাড়িতে ওঠা এবং অবতরণ করা-দুইই তার পক্ষে নিত্য সংগ্রাম। সে গাড়ি থামায়, পলাশ তার তালবেতাল লাঠি দুটি দেয়। দরজা খুলে একটু কোনাকুনি অবস্থানে গড়গড়িটি (হুইল চেয়ারটি) রাখে। টোপর ডানহাতের ভরে শরীরটি ঘষটে নিয়ে আসে আসনের প্রান্তে। ঘুরে বসে। দু'হাতের দুই লাঠি ভূমিতে ভালরকম স্থাপন করে কয়েক পলের জন্য শরীরটাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিয়ে যায় এবং গড়গড়ির আসনে বসে পড়ে। গড়গড়ি ঝাঁকুনি খায়। পলাশ শক্ত করে ধরে তাকে। বাঁদিকে কেৎরে লটকে থাকা অশক্ত দুই পা হাত দিয়ে ধরে একটা একটা করে পাদানিতে রাখে টোপর। সচল হয়। সিঁড়ি এলে আবার সে লাঠি পরায় হাতে, আস্তে আস্তে সবল দুই বাহুর ওপর নিজেকে সঁপে দেয়। পলাশ তার গড়গড়িখানা সিঁড়ি দিয়ে সমতলে নিয়ে যায়। টোপর অতি সন্তর্পণে লাঠি রাখে ধাপে। প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ। তৃতীয় ধাপ। তার পা দুটি ছেঁচড়ে উঠতে থাকে। ঠোক্কর খেতে খেতে। ধুলো মাখতে মাখতে। টোপর ঘেমে ওঠে। নিজের অসাড় অঙ্গ বয়ে চলা কী ভীষণ কঠিন!"[১১]

প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি অপ্রতিবন্ধী মানুষদের অবজ্ঞার বিষয়টিও ঔপন্যাসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

> "বাইরে বেরোলে এই স্বাদু পৃথিবী টোপরের জন্য যুদ্ধভূমি হয়ে যায়। তার জ্ঞান ও মেধা, বুদ্ধি ও হৃদয়— সমস্তই সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর। মেধা ও বুদ্ধির নিরিখে সে বিশিষ্ট একজন, হৃদয়খানি উদার ও বিশাল বটে। তবু, যারা অবিকলাঙ্গ, তারা বিকলাঙ্গের প্রতিবন্ধকতা তার সর্বত্র দেখতে শুরু করে। ব্যাখ্যাতীত ত্রাসে তার মনের নিকটে আসে না। টোপরকে, সর্বত্র, স্বাভাবিক মানুষের প্রতিবন্ধী চিন্তার সঙ্গেও রণে অবতীর্ণ হতে হয়।"[১২]

ঔপন্যাসিকের প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তার সীমাবদ্ধতার দিকটিকেও আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। টোপরের নিজেকে স্বাবলম্বি তথা স্বনির্ভর করার প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, প্রতিবন্ধকতা জয় করার অন্য নাম আনন্দ! কিংবা--

> "অপরিসীম মনের জোরে টোপর এই সক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। টোপর নিরন্তর সংগ্রামী। যতখানি সম্ভব, প্রতিবন্ধকতা জয় করার প্রয়াসী। ঘরের মধ্যে যাবতীয় কাজ সে একাকী পারে। বাইরে বেরুলে সঙ্গী ছাড়া চলে না। এখানেই সে চিরকালের জন্য হেরে বসে আছে।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধকতাকে আসলে কখনই জয় করা যায় না, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষকে তার প্রতিবন্ধকতাকে নিয়েই সারা জীবন বসবাস করতে হয়। বিকল্প নানান উপায়ে প্রতিবন্ধকতাজনিত বাধাকে কিছুটা অতিক্রম করা যায় মাত্র। এই বিষয়টিকেই অনেকে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা বলে মনে করে থাকেন।

আসলে এর ফলে অনেক সময়ই প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে ঈষৎ লঘু করে দেখা হয় এবং তার প্রতিফলন দেখা যায় প্রতিবন্ধকতাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের ঔদাসীন্যের মধ্যে যা প্রতিবন্ধী মানুষদের আত্মোন্নতির পথকে অনেকাংশেই শ্লথ করে দেয়। এটাই সমস্যা। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই প্রতিবন্ধকতাবিদ্যায় প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী তথা জীবনব্যাপি অসামর্থ্য হিসেবে বিবেচনা করে অতিশয় গুরুত্বের সাথে বিষয়টিকে মোকাবিলা করার কথা বলা হয়ে থাকে।

এই উপন্যাসে একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে ঝুমু ও টোপরের প্রেমের প্রসঙ্গ কিন্তু ঝুমু ও টোপরের এই প্রথা বহির্ভূত প্রেমের থেকেও আমাদের কাছে এখানে বিবেচ্য টোপরের নিঃসঙ্গতা এবং বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি।

> "স্কুল-কলেজে, কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কিংবা তার চেনা পরিসরে কোনো মেয়ে তাকে বলেনি 'ভালবাসি', সেও কাওকে বলেনি। সে বাধ্য হয়েছে নিজের জগৎ নিজের মতো করে গড়ে নিতে। কোন পরিস্থিতি টোপরকে বাধ্য করেছে তার থেকে ৪ বছরের বড় দিদি স্থানীয় এক নারীরপ্রতি প্রেমাসক্ত হতে আমাদের কাছে সেটিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিয়মিত ইস্কুলে যেতে পারত না, তাই টোপরের কৈশোরের বন্ধু ঝিরি আর ঝুমু। মাঠে খেলা করতে পারত না, তাই তার শৈশবের সাথী ঝিরি ও ঝুমু। আজও, তেইশের যৌবরাজ্যে, টোপরের অন্য বন্ধু নেই। ঘনিষ্ঠ। প্রিয়। আজ কেবল ঝুমু।"[১৪]

মাত্র আট বছর বয়সে টোপরের মা তাকে ফেলে চলে যাওয়ার পর তার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড় ঝুমুই টোপরের সব দায়িত্ব সামলেছে। সেই তার মা, বন্ধু, একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছে; এবং বয়সসন্ধির সময় সেই নির্ভরতাই রূপান্তরিত হয়েছে পবিত্র প্রেমে। সব প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনে নিশ্চয় এমন প্রথাবহির্ভূত প্রেমের আগমন ঘটে না, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধী মানুষদেরই তো এমনই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়। বৃহত্তর সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই তারা শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ফলত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা অন্তর্মুখী এবং ঈষৎ কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতির হয়ে থাকে।

টোপরের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্মুখী জগৎকে ঔপন্যাসিক যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। ঝুমুরকে ঘিরে টোপরের রোমান্টিক কল্পনার অবাধ বিস্তার।

> "তুমি তোমার ওড়না পেতে দাঁড়াবে, আমি সমস্ত উপার্জিত ধনসম্পদ দেব তোমার আঁচলে। তুমি তোমার লাল বাঁধানো খাতাখানি নিয়েবসবে হিসেব কষতে। আমাদের সমস্ত জমাখরচের ভার যে তোমারই 'পরে। প্রতিমাদি কৃষ্ণপত্র ভেজানো চিনেমাটির কাতলিখানা রাখবে এনে তোমার-আমার মাঝখানে, সঙ্গে দুটি ধবধবে সাদা চিনেমাটির পেয়ালা। চায়ের সুগন্ধে তোমার আনমনা মুখে একচিলতে হাসির রেখা, তারই 'পরে বিজলি বাতির আলোছায়ার খেলা। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখব তোমার অপার্থিব লাবণ্য। দেখব আমার সুখ। আমার শান্তি।"[১৫]

আবার ঝুমুর কথা ভেবে প্রেমার্ত টোপরের অন্তর্মুখি ভাবনা –

> "নদীর নিমন্ত্রণে নৌকা ভাসাই। চঞ্চলা তরলিতা নদী ঢেউয়ের দোলায় উলটে পালটে দেখে। ভেঙে দেয় আমার তরণী। তারপর আমাকে আছড়ে ফেলে নরম ফেণিল জলদেহে। আমি তার বুক খুঁজি। স্তন খুঁজি। গাঢ় খাঁজে মুখ দিতে চেয়ে ক্রমশ গভীরে গহনে ডুবে যাই। কবে জল দেবে তুমি হে আকাশ। কবে তরলিত হবে যুগ যুগ ধরে বিশুষ্ক বিবাগী যোনি! কবে তুমি আমারই একান্ত হবে হে প্রিয় রমণী?"[১৬]

আবার টোপর যেভাবে ঝুমুকে মনে মনে অপরূপ সাজে সাজিয়েছে বা যেভাবে রাতের পর রাত পরের দিন দোকানে কি রঙের শাড়ি দেখতে পাবে সে কথা ভেবেছে তাতে তার কল্পনাপ্রবণ মনের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টোপর ও ঝুমুর মধ্যে তাদের সম্পর্কের বিকাশের যে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটি ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু উপন্যাসের নিরিখেই নয়, এই বিষয়টির একটি গূঢ় সমাজমনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন একজন প্রতিবন্ধী মানুষের সংবেদনশীল হৃদয়ের আভাস দেওয়া হচ্ছে তেমনই অপরদিকে একটু একটু করে আপামর প্রতিবন্ধী মানুষদের কাঙ্ক্ষিত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও তৈরী হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে কথাপ্রসঙ্গে টোপর ঝুমুকে নারীনির্যাতন, পরিবারে নারীদের বৈষম্যমূলক অবস্থান, বিয়ের অসারতা ইত্যাদি নানান সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকছে একটি অমোঘ সত্য - প্রতিবন্ধীরাও এই সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারাও এই সমাজের বাইরে নয় এবং তাদেরও বিভিন্ন বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য থাকতে পারে।

এ উপন্যাসে অবশ্য ঝুমুকে পেয়েছে টোপর তা সে যে কারণেই হোক, কিন্তু বাস্তবে কত জন প্রতিবন্ধী প্রেমিক পায় তার প্রার্থিত অপ্রতিবন্ধী প্রেমিকাকে? পায় না বলেই উপন্যাসের পাতায় অন্তত এই দুটি মানুষের জীবনধারাকে মিলিয়ে দেওয়ার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। আমাদের খুব সহজেই মনে পড়ে যায় 'জোনাকিদের বাড়ি' উপন্যাসের দৃষ্টিহীন মেঘলার কথা; যে নিশানকে তার প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।[১৭] শুধু তাই নয়, চরম ভালবাসা বুকে নিয়েও কেবলমাত্র 'লোকে কি বলবে' এই চিন্তায় এবং সংস্কারের বাইরে বেরোতে না পেরে কত মানুষ কোনো না কোনো অজুহাতে ছেড়ে দেয় প্রতিবন্ধী মানুষের হাত। আর কত কাল, কত কাল চলবে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনাপ্রবাহ, কত কাল প্রেমের কবর রচনা করবে দ্বিধা ও সংস্কারের পাথর? ঝুমু ও টোপরের এই যৌথজীবন যদি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথকে কিয়দাংশেও প্রশস্ততর করে, তাহলে ক্ষতি কি?

প্রতিবন্ধী প্রেমিকরা যে তাদের জীবনসঙ্গীর পর্যাপ্ত খেয়াল রাখতে পারে না, বা প্রতিবন্ধীরা যে যৌনভাবেও প্রতিবন্ধী -- সমাজে প্রচলিত এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাকে একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঝুমু ও টোপরের পারস্পরিক নির্ভরতা তথা সুন্দর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। স্মরণীয় : "ওষ্ঠে-অধরে মেশা বিপুল প্লাবন! নদী হয়ে গেল ঝুমু। সমুদ্রসমান হয়ে শতরূপ নামের যুবক তাকে পুরোপুরি অধিকার করে নিল।

> "কে ওই নারী? সংস্কারহারা! লজ্জাহীন! ভয়হীন! কেবল প্রেমের জোয়ারে ভেসে উঠে আসে কোন এক অর্থময় রতিব্যঞ্জনায়। অসাড় পা সমেত অর্ধাঙ্গ যুবক, রতিদেবী তাকে আলিঙ্গন করেন। অগ্নিময়ী দেবিকা ধীরে ধীরে ইন্দ্রাসনা হয়ে উঠলেন। শতরূপ দেব দু'হাতে ধারণ করলেন ক্ষীরামৃতভরা ঘট। আর মন্থন হতে লাগল রসপারাবারে।"[১৮]

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সন্তানদের অভিভাবকদের মিশ্র মনোভাবটিকে চিহ্নিত করে প্রতিবন্ধকতাসংক্রান্ত সমস্যার একেবারে গভীরে প্রবেশ করে গেছেন ঔপন্যাসিক। সন্তানের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিতে না পেরে টোপরের মা রূপাঞ্জলী টোপর ও তার বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে; কিন্তু টোপরের বাবা প্রবীর টোপরকে বুক দিয়ে আগলে রেখে যত্ন করে মানুষ করে তুলেছেন। প্রবীর যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছেন টোপরের মা, বাবাও বন্ধু।

সর্বোপরি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদেরও যে আর পাঁচ জন অপ্রতিবন্ধী মানুষদের মতোই মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার আছে সে বিষয়টিকে অতি সুস্পষ্টভাবে এই উপন্যাসে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা দেখি যে, টোপর যথাসম্ভব স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সে এমন একটি কাজকে তার পেশা হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছে যাতে তাকে কারও করুণা বা দয়ার পাত্র না হয়ে থাকতে হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে সে যেমন তার পড়াশোনাকে সাবলীলভাবে চালিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনই এই কম্পিউটারের মাধ্যমেই সে তার জীবিকা নির্বাহের পথ করে নিয়েছে। সসম্মানে আত্মমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার এই যে অনমনীয় প্রত্যয় তা টোপরের চরিত্রটিকে একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দান করেছে। প্রতিবন্ধী আন্দোলনের কর্মীরা তো প্রতিবন্ধী মানুষদের এই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পেই নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, অন্ধ চরিত্রচিত্রণে ঔপন্যাসিকের যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছিল টোপরের চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সে সব অনেকটাই শুধরে নেওয়া হয়েছে। আসলে প্রতিবন্ধকতা একটি এত জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে পদে পদে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যাই হোক, পরিশেষে উল্লেখ্য যে, বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা থাকলেও তিলোত্তমা মজুমদার যেভাবে একটি সদর্থক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের কথা বলতে চেয়েছেন তার সাহিত্যে, তা নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সেই সমস্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের তথা একটি যথার্থ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রগতিশীল সংগ্রামের কথা পাঠকদের দরবারে পৌঁছে যাবে।

তথ্যসূত্র :

১. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 1, 6 December, 2006)
২. মজুমদার, তিলোত্তমা, বসুধারা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, ২০২০, পৃ. ৪৯০
৩. ঐ, পৃ. ৪৮৭-৮৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৮৭
৫. ঐ, পৃ. ৪৯৯
৬. ঐ, পৃ. ৫৭১
৭. বর্তমান প্রাবন্ধিকের নেওয়া তিলোত্তমা মজুমদারের সাক্ষাৎকার, ২০-০৫-২০২২
৮. বসুধারা, পৃ. 593
৯. ঐ, পৃ. ৬৬৪
১০. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম খন্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ, তৃতীয় ভাগ একাদশ খন্ড প্রথম অধ্যায়, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, ১লা জানুয়ারি পৃ. ৪৯৭
১১. মজুমদার, তিলোত্তমা, ঝুমরা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৮, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, ২০২০, পৃ. ৪০
১২. ঐ
১৩. তদেব, পৃ. ২৮
১৪. ঐ
১৫. ঐ, পৃ. ২১
১৬. ঐ, পৃ. ৪৫
১৭. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, জোনাকিদের বাড়ি, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৯, ২৩ / ১৩৭-৩৮
১৮. ঝুমরা, পৃ. ১৫০

গ্রন্থপঞ্জী :

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তমসা, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫৭
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনপুরের হাট, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ও সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮বঙ্গাব্দ

৩. তিলোত্তমা মজুমদার, ঝুমরা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৮, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, ২০২০
৪. তিলোত্তমা মজুমদার, বসুধারা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, ২০২০
৫. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী চরিত্র, পরম্পরা, কলকাতা, ২০১১
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাট, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, সংশোধিত সংস্করণ, ২০১৭
৮. সমরেশ বসু, মহাযুদ্ধের পরে, সরোজ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সমরেশ রচনাবলী ২য় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৮
৯. সোমেন চন্দ, অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের এক দিন, দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত, সোমেন চন্দ ও তার রচনা সংগ্রহ, নবজাতক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ৫ই আগস্ট, ১৯৫৭
১০. স্মরণজিৎ চক্রবর্তি, জোনাকিদের বাড়ি, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৯
১১. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম খন্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, ১লা জানুয়ারি
১২. HENRI-JACQUES STIKER, A History of Disability, Translated by William Sayers, THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS, December 2019
১৩. Edited by Lennard J. Davis, The Disability Studies Reader, Sixth Edition, Routledge 52 Vanderbilt Avenue, New York, 2021
১৪. United Nations Conventions on Rights of Persons with Disabilities 13.12.2006
১৫. প্রাবন্ধিকের নেওয়া তিলোত্তমা মজুমদারের সাক্ষাৎকার, ২০-০৫-২০২২